# হেমাঙ্গদা : একলব্যের স্মৃতিতে ও মূল্যায়নে

দিলীপ বাগচী

বাঁচবো বাঁচবো রে আমরা,
বাঁচবো রে বাঁচবো,
ভাঙ্গা বুকের পাঁজর দিয়া
নয়া বাংলা গড়বো ।

১৯৫১ সালে হাওড়া গোলমোহর এভিন্যুর এক জলসায় এক তরুণ শিল্পীর কণ্ঠে এক নতুন স্বাদের ও নবতর চেতনার এই গান আমার মত এক উদ্বাস্তু কিশোরের মনে এক নতুন তরঙ্গাভিঘাত সৃষ্টি করেছিল । আমার জীবনে প্রথম শোনা গণসঙ্গীত ঐটি । সেই শিল্পীকে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছিলাম, গানটির রচয়িতা ও সুরকার হেমাঙ্গ বিশ্বাস । তাঁর কাছ থেকে গানটি লিখে নিয়েছিলাম । বন্ধু মহলে গানটি গাইলে কেউ কেউ বলতো, ওটা 'কমিউনিস্টদের গান' । তখনো কমিউনিস্ট পার্টি ছিল বেআইনী । এই গানই আমাকে টেনে এনেছিল গণনাট্য সংঘে - কমিউনিস্ট পার্টিতে ।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গলার রেঞ্জ-এর কথা প্রায় মিথ-এর পর্যায়ে ছিল তখনই । তাঁর নিজের গলায় গান শুনেছি আরো বছর আটেক বাদে । হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'আমরা তো ভুলি নাই শহীদ' বহু জনসভায় গেয়ে তখন আমি এক উঠতি গণসংগীত-এর শিল্পী । আমার কাছে প্রায় প্রতিটি জনসভায় ও সংগীতের আসরে দাবী আসতো দু'টি গানের, তার একটি 'আমরা তো ভুলি নাই শহীদ', অপরটি 'শোনো গো দূরের পথিক' (অহল্যার গান) । নিজের গলার রেঞ্জ সম্পর্কে বন্ধুদের প্রশংসার ফলে একটা আত্মশ্লাঘা জন্মেছিল বৈ কি! পরে বুঝেছি এটা ছিল কূপমন্ডুকের শ্লাঘা ।

('১৯৫৮-৫৯ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কৃষ্ণনগর শাখা 'সংস্কৃতি সংসদ'-এর বার্ষিক সম্মেলনে প্রথম হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গলা শুনি । সেদিনের আসরের মূলগায়ক ছিলেন পূর্ণদাস বাউল । মঞ্চের এক কোণে এসে বসলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস । লম্বা, শীর্ণকায়, শ্যামবর্ণ মানুষটি । মুখে সর্বদা লেগে থাকা প্রাণখোলা হাসির ছাপ । হাতে একটি একতারা । পূর্ণদাস ধরলেন,

আমার একলা যেতে ভয় করে,
চল গুরু দুই জন যাইবারে ---

হেমাঙ্গ বিশ্বাস ঐ চড়া পর্দার ওপর আর এক পর্দা চড়িয়ে হার্মনি ক'রে ধরলেন

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

পূর্ণদাসের সঙ্গ । পূর্ণদাস হাত জোড় ক'রে প্রণাম জানিয়ে একপাক ঘুরে আবার ধরলেন গান । সমবেত কয়েক হাজার শ্রোতা টাউন হলের মাঠ কাঁপিয়ে করতালিতে অভিনন্দিত করলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে । পরে তিনিও এককভাবে কয়েকটি গান গাইলেন । সেদিন শুনেছিলাম হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গলার রেঞ্জ । ঐ দিন আমিও গেয়েছিলাম 'আমরা তো ভুলি নাই শহীদ' । মঞ্চের বাইরে এলে হেমাঙ্গ বিশ্বাস জড়িয়ে ধরে বললেন, "কার লগে শিখছ ? কয়্যাক জায়গায় গোলমাল আছে । তা হউক, তুমি ইমোশনডা ঠিক ধরছ, রেঞ্জডাও মন্দ না ।" আমি তো আনন্দে দিশাহারা । সেদিন থেকে হেমাঙ্গ বিশ্বাস আমার কাছে হেমাঙ্গদা হ'য়ে গেলেন ।)

হেমাঙ্গদা আর নেই । বয়স হয়েছিল । তবু ভাবতে ভীষণ কষ্ট লাগছে । কারণ, হেমাঙ্গদা ফুরিয়ে যান নি । হেমাঙ্গদার সাথে অতিঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বা চিঠিপত্রের কোনও আদানপ্রদানও ছিল না । তবু হেমাঙ্গদা ছিলেন আমার অতি আপনজন । সেই ১৯৫১ সাল থেকে ওঁকে আমার সুরের গুরু বলে মেনে নিয়েছিলাম । তাই হয়তো বা বললে ভুল হবে না যে আমি ছিলাম ওঁর একলব্য শিষ্য । তাঁর গানের ভেতর দিয়েই তাঁর সাথে জানাশোনা ।

হেমাঙ্গদার গানগুলিকে চিহ্নিত করা যায় কয়েকটি পর্বে । আর, শিল্পী রূপকার হিসেবেও তাঁর পরিণতিকে তারই মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায় । চীনে যাবার আগে পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টিকে প্রথম পর্ব বলা যেতে পারে । এ সময় পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-তিস্তা-সুর্মা-মেঘনা উপত্যকার জনজীবন ও লোকসংগীতে তিনি সম্পৃক্ত । তাই এই সময়ের গণআন্দোলন গণসংগ্রামের সংগীত রূপকার হিসেবে তিনি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে গীতিকার ভাষায় ও সুরে ঐ সব এলাকার ভাষা ও সুরকে অঙ্গীকৃত করেছেন । ফলে গানগুলি অতি সহজে পৌঁছে গেছে জনমানসে। পরিশীলিত বুদ্ধিজীবী তাবৎ শ্রোতার কাছে পৌঁছতে গেলে যে বাণিজ্যিক প্রয়োগকুশলতার তথা চটকদারীর প্রয়োজন, তা তাঁর গানে ছিল না । তিনি তার প্রয়োজনও হয়তো অনুভব করেন নি । কিন্তু সে কারণে তাঁর গান ব্যর্থ হয়নি । যে উদ্দেশ্যে তাঁর গান রচিত হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য সাধনে অর্থাৎ গণসংগ্রামের সাংস্কৃতিক হাতিয়ার হিসেবে তাঁর গান ছিল অনেক ধারালো ও অব্যর্থ । হেমাঙ্গদা তাঁর গানের কথার সঙ্গে সুরের প্রয়োগ ছাড়াও আরেকটি যে জিনিষ দিয়েছিলেন, তা গানের প্রাণ, অর্থাৎ অন্তরের অকৃত্রিম আবেগ, যা কিনা জনজীবনের সাথে সাক্ষাৎ ঘনিষ্ঠতা না থাকলে সম্ভব নয় । এই আবেগ ছিল তাঁর গানের অমূল্য সম্পদ - এটা অনুশীলনের বস্তু নয়, অনুভবের বিষয় । এই

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

পর্বের যে কোন গান - কি সিরিয়াস গান, কি ব্যঙ্গ গান - সবের ভেতরই এই আবেগ অনুভূত হয় । দেশ বিভাগের বেদনা তাঁর গণসংগীতে যেমন মরমী রূপলাভ করেছে এমনটি আর কারোর গানে শোনা যায় না, যদিও সে সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশ বিভাজন নিয়ে অনেক গণসঙ্গীতকার সঙ্গীত রচনা করেছিলেন । হেমাঙ্গদার ব্যঙ্গ গানের মধ্যেও লুকিয়ে আছে এই বেদনা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত । এই পর্বের কয়েকটি গান (অবশ্য পছন্দটা নিতান্তই ব্যক্তিগত) প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যাক । 'বাঁচবো বাঁচবোরে আমরা', 'লঙ্গর ছাড়িয়া নাওয়ের দে দুখী নাইয়া', 'তোরা বল সখি বল বল, বল আমারে', 'কাস্তেটারে দিও জোরে শান কিষাণ ভাইরে', 'আমার মন কান্দেরে পদ্মার চরের লাইগ্যা' ইত্যাদির সাথে লোকসঙ্গীতের সুরে রচিত 'আজাদী হয় নি আজো তোর' এবং উদ্দীপ্ত করা গান 'জালিনাবাগের জালালাবাদের এসেছে আদেশ' (এটির সুরকার প্রয়াত জর্জদা - অর্থাৎ দেবব্রত বিশ্বাস) । হেমাঙ্গদার গান কোন তাৎক্ষণিক উদ্দীপনা দিতে পেরেছে খুব কম - কারণ সুরের ক্ষেত্রে তিনি পাশ্চাত্য উদ্দীপক সুরের মিশেল বা ছন্দের মিশেল দেন নি, এদেশের জনগণের জিনিষ জনগণের কাছ থেকে নিয়ে তাকে আবার জনগণের কাছেই পৌঁছে দিয়েছেন বিষয়ের ও মাত্রার বদল ঘটিয়ে । পূর্ব ভারতের লোকগীতির সুর গণসঙ্গীতে ব্যবহারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে গেছেন তিনি । আমরা এই শিক্ষা পেয়েছি তাঁর গান থেকেই । তাঁর গান শোনবার অনেক অনেক দিন পরেও হৃদয়ের তন্ত্রীতে তা অনুভূত হতো - এটাই ছিল তাঁর গানের বৈশিষ্ট্য ।

ব্যঙ্গ গানের মধ্যে 'মাউন্ট ব্যাটন মঙ্গল কাব্য' তো ধ্রুপদী রচনার পর্যায়ে পড়ে । এত সার্থক তীব্র বিদ্রূপাত্মক তথা সুপ্ত বেদনা মিশ্রিত ব্যঙ্গ গান, কি কথায় কি সুরে, আর দ্বিতীয়টি রচিত হয় নি । উল্লেখযোগ্য 'আজব যুগের আজব কথা কুন যুগে হুনছনি' ব্যঙ্গ গানটিও ।

তাঁর ভাষা ও সুরের পূবী বৈশিষ্ট্যের কারণে হেমাঙ্গদা পূর্ববঙ্গীয় মানুষের কাছে অনেক বেশী জনপ্রিয় ছিলেন, জনপ্রিয় ছিলেন অসমীয়া জনগণের কাছেও ।

চীন থেকে ফিরে আসার পর হেমাঙ্গদা, শারীরিক কারণেও বটে রাজনৈতিক কারণেও বটে, যেন ধীরে ধীরে জনজীবন থেকে সরে এসেছেন - সরে এসেছেন গণসংগ্রামের এদেশীয় ধারা থেকেও । কিন্তু সংগ্রামী চেতনাকে ঝেড়ে ফেলতে পারেন নি । তাঁর ভেতরে যেন তখন একটা নিরাপত্তাবোধও কাজ ক'রে চলেছে । একটা দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব তাঁকে দীর্ণ করছে । বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রথম



সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

জীবনের অঙ্গীকারের দ্বন্দ্ব । এই দ্বিতীয় পর্বে, এই দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি খুঁজেছেন অনুবাদ সংগীতের মধ্যে । এই দুই পর্বের মাঝখানে রয়েছে তাঁর সাঙ্গীতিক জীবনের একটা যুগসন্ধির পর্ব । এই পর্বে তিনি 'কল্লোল' (উৎপল দত্তের) নাটকের সুরকার । তিনি ইচ্ছা করলে, বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করলে যে কত সার্থক হতে পারেন তার প্রমাণ রাখলেন 'কল্লোলে' । আবার এই 'কল্লোল' নাটক তাঁর পরিণত প্রতিভার দলিলও বটে । ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকসংগীতের সুর ও পাশ্চাত্য সুরের ব্যবহারে সৃষ্ট গানগুলি ছিল 'কল্লোল'-এর অন্যতম সম্পদ । পরে 'তীর', 'লাল লণ্ঠন', 'রাইফেল', 'তেলেঙ্গানা' (১৯৭৯) নাটকেরও তিনি গীতিকার ও সুরকার ছিলেন ।

হেমাঙ্গদা'র দ্বিতীয় পর্বের অনুবাদ সঙ্গীতগুলিও তরুণ বুদ্ধিজীবি বিপ্লবীদের কাছে পরম আদরণীয় হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ব্যাপক জনজীবনকে সেভাবে স্পর্শ করতে পারেনি । কারণ ঐ সব গানে সমকালীন দেশীয় বিষয়বস্তু ছিল না, ছিল না সেই উত্তাল সময়ের থরো থরো আবেগের ছাপ । এই পর্বের উল্লেখযোগ্য গানগুলি হচ্ছে, 'জন হেনরী', 'জন ব্রাউন', 'ভার্শাভিয়াঙ্কা', 'উই শ্যাল ওভারকাম', 'ফুলগুলি কোথায় গেল' (পীট সিগারের একটি বিখ্যাত গানের অনুবাদ), 'রুশ দেশের কমরেড লেনিন' (ল্যাংস্টন হিউজেসের কবিতার বিষ্ণু দে-কৃত অনুবাদ) - ইত্যাদি । অবশ্য হেমাঙ্গদা তাঁর নিজের এই ঘাটতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই, সে সময়ের জনজীবনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে যে সঙ্গীতকারেরা সে যুগের যন্ত্রণা ও সংগ্রামকে সঙ্গীতে রূপ দিয়েছিলেন - তাঁদের কিছু নির্বাচিত গীতিকা তাঁর নিজের গীতিকার সংকলনের সাথে যুক্ত করে তাঁর অক্ষমতাকে পরোক্ষে স্বীকার করে তাঁর উত্তরসূরীদের স্বাগত জানিয়ে একটা অনুকরণীয় উদাহরণ স্থাপন করলেন ।

১৯৮১ সালের ৮ই জুন হেমাঙ্গদার নাকতলার বাড়িতে হেমাঙ্গদার সাথে শেষ সাক্ষাৎকার । সঙ্গে ছিলেন গণসঙ্গীত-শিল্পী রমেন সাহা । হেমাঙ্গদা জড়িয়ে ধরে বললেন, ''তুমি নাকি বেশ কয়ডা ভাল গান করছ । রমেনের লগে শুনছি । ইস্ আগে জানলে আমার সংকলনে ছাপাইতাম ! শুনাইবা নাকি ? একদিন আস সময় কইরা । পরের সংকলনে তোমার কিছু গান দিমু । পাঠাইও ।'' নিজে হাতে চীনা চা খাওয়ালেন । এ বস্তু হেমাঙ্গদার কাছে অনেকেই খেয়েছেন । ঘর থেকে নিজের গানের সংকলন বইয়ের একখন্ড এনে লিখে দিলেন, ''গীতিকার দিলীপ বাগচী সুহৃদ্বরেষু -- হেমাঙ্গ বিশ্বাস (চীনা অক্ষরেও নাম লিখলেন), ৮. ৬. ৮১ ।'' গীতিকার হিসেবে আমার সুরের গুরুর



সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

কাছ থেকে পাওয়া এই স্বীকৃতি আমার জীবনের অন্যতম একটি প্রাপ্তি । তবে আর যাওয়াও হয় নি, গান পাঠানোও হয় নি ।

যে কথা আগেই বলেছি, শেষ দিকে বাণিজ্যিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে গিয়ে তিনি যেন বার বার দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগেছেন । নিজের একটি গানের দল (মাস সিংগার্স ) খুলেছিলেন । বেতার-দূরদর্শনে দেখা দিয়েছেন, যাত্রাপালাতে সুর দিয়েছেন, অবশেষে সলিল চৌধুরীর উদ্যোগে সত্তরোর্ধ্ব হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গানের ক্যাসেটও বেরিয়েছে । ঐ বয়সেও তাঁর গলার আশ্চর্য রেঞ্জ ও গণসঙ্গীতের আবেগ আমরা প্রত্যক্ষ করি, যদিও অল্প মাত্রায়, ঐ ক্যাসেটে । অনেকেই অনুযোগ করেছেন, গানের আসরে যেতে গেলে নাকি হেমাঙ্গদা 'বড্ড বেশী চার্জ করেন', 'বড্ড কমার্শিয়াল হয়ে গেছেন' । কিন্তু আবার এও শুনেছি, হেমাঙ্গদা বহু সেরকম আসরে কেবলমাত্র যাতায়াত ভাড়ার বিনিময়েও গান গেয়েছেন । আসলে আমরা ভুলে যাই যে, গণসঙ্গীত শিল্পীকেও খেয়ে পরে বাঁচতে হয় ; গণ-লেখক বা গণকবির কিছু জৈবনিক প্রয়োজন মেটাতে টাকা লাগে । আমরা, পৃষ্ঠপোষকরা বা রাজনৈতিক কর্মীরা যদি সে কথাটা ভুলে যাই, তবে তাঁরা বাঁচবেন কি ক'রে ? একজন গণসঙ্গীতশিল্পী অবশ্যই একজন কৃষক বা শ্রমিক সংগঠনের কর্মীর চেয়ে ভিন্নতর জীবন যাপন করেন, তাঁর শিল্পসৃষ্টির প্রয়োজনেই, এবং তাঁর সেই প্রয়োজন পূর্ণ করার দায়িত্ব জনগণের । জনগণের সচেতন অংশ একথাটা যদি না বোঝেন তবে কে বুঝবে ? হেমাঙ্গদার অনেক অভিমান ছিল এই সব কারণে, অনেকটা সঙ্গত ভাবেই । তাই হেমাঙ্গদা বার বার অভিমান করে কমার্শিয়াল হ'তে গিয়েছেন । গণনাট্য সংঘের মঞ্চকে তো অনেকেই জীবনে আর্থিক প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ হিসেবে ব্যবহার করেছেন, অর্থ খ্যাতি প্রতিপত্তির স্বর্ণশিখরে উঠেছেন অনেকেই । সংগ্রামী গণনাট্য সংঘ ছেড়ে যাওয়া অনেকেই তো দেখছি আজ বুর্জোয়া সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে বুর্জোয়া আশীর্বাদপুষ্ট 'সমাজতান্ত্রিক' রাজ্য সরকারের সংগ্রাম-বিলাসী সাংস্কৃতিক মঞ্চে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে । এঁদের কারো চেয়েই হেমাঙ্গদার ক্ষমতা কম ছিল না । হেমাঙ্গদা-ও ইচ্ছা করলে সে পথে যেতে পারতেন । পরিশীলিত স্রষ্টা হিসেবে তিনি কতটা উঁচু মানের ও মাপের ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর 'শঙ্খচিলের গান' । কিন্তু তিনি তা যান নি, যেতে পারেন নি - কারণ অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তিনি ছিলেন জনগণের কাছেই দায়বদ্ধ বিপ্লবী সংগ্রামের কাছের বন্ধু । হেমাঙ্গদার গান আদৌ হেমাঙ্গদার রচনা কিনা, এ নিয়ে অসুস্থ বিতর্কও হয়েছে । এতে হেমাঙ্গদার জনপ্রিয়তাই প্রমাণিত । গণসঙ্গীত (এমন কি লোকসঙ্গীতও) কোনও



সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

ব্যক্তির প্রতিষ্ঠালাভের হাতিয়ারে পরিণত হ'লেই এমন বিতর্ক ওঠে - তাই এটাকে অসুস্থ বিতর্কই বলছি। হেমাঙ্গদা শেষদিকে কিছুটা পেশাদার গণশিল্পী হয়েছিলেন বটে, কিন্তু পেশার সাফল্যের জন্য গণসঙ্গীতকে বাণিজ্যিক রূপ দেন নি - সেটা আজ অনেকেই করছেন এবং যে কারণে গণসঙ্গীত আজ জনগণের সংগ্রামের হাতিয়ার না হ'য়ে যাত্রাদলের সেনাপতির হাতের শোভা, জাঁকজমকপূর্ণ ভোঁতা তলোয়ারে পরিণত হয়েছে। হেমাঙ্গদা ইচ্ছা করলে এটা করতে পারতেন এবং তার জন্য তাঁকে কারো কাছে কোনো কৈফিয়ৎও দিতে হ'ত না।

হেমাঙ্গদা যেমন, হয়তো পুরনো দিনের বন্ধু ও অনুরাগীদের টানে কিম্বা সরকারী বামপন্থার স্বীকৃতিলাভের মোহে অনেক সময় সরকারপন্থী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের দিকে গেছেন (এটা অবশ্যই তাঁর দুর্বলতার দিক) - তেমনি বন্দীমুক্তি আন্দোলনের পাশে, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবীর পাশে কিম্বা 'হোপ ছিয়াশী'র অপবাম-কৃষ্টির বিরুদ্ধে আন্দোলনের পাশেও এসেছেন সক্রিয়ভাবে। আমরা তাঁর এই ইতিবাচক ভূমিকাগুলিকেই গ্রহণ করব। হেমাঙ্গদা আমাদের কাছে শেষ পর্যন্ত হেমাঙ্গদা-ই ছিলেন। তাই তাঁর পরিণত বয়সের মৃত্যুকেও অকালপ্রয়াণ বলে বুকে বাজে।

[ অনীক (ফেব্রুয়ারী-মার্চ, ১৯৮৮) পত্রিকার সৌজন্যে ]

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।